বাংলাদেশের বিশ বছর ঃ শিক্ষা ও শিক্ষাক্রম

ডঃ আবদুল্লাহ আল–মুতী শরফুদ্দিন

18 FEB 1992
কল— ৪

বিদ্যালয়গুলির হালও প্রায় এমনি। প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটেছে গত দু'দশকে মাত্র দেড়গুণের মতো, অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে তার সঙ্গেও তাল মিলিয়ে এগোতে পারেনি। স্বাস্থ্য–সুবিধে, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন, আবাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মানের দিক দিয়ে বাংলাদেশের স্থান যে পৃথিবীর সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলির মধ্যে, এ থেকেই সম্ভবত তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই থিওডোর শুল্জ, ঘন ডেইজি, আর্থার লিউইস প্রমুখ বেশ কিছু প্রথম সারির অর্থনীতিবিদ শিক্ষার সঙ্গে জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির গভীর সম্পর্ক নিয়ে কতকগুলি মূল্যবান গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরি জিন বো'ম্যান ও সি.আরনল্ড অ্যান্ডারসন দেখান যে, ১৯৫৫ সালে দুনিয়ার যে ক'টি দেশে বয়স্ক স্বাক্ষরের হার ছিল ৯০ শতাংশের বেশি, শুধু সে সব দেশেই মানুষের গড় মাথাপিছু আয় হয় ৫০০ ডলারের ওপরে; আবার যেসব দেশে স্বাক্ষরের হার ছিল ৩০ শতাংশের কম, শুধু সে সব দেশেই মাথাপিছু আয় হয় ২০০ ডলারের নিচে।

পরবর্তী দশকগুলিতে নানা দেশের অর্থনীতিবিদরা দেশের আর্থ–সামাজিক অগ্রগতিতে শিক্ষার এবং সামগ্রিকভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের মৌলিক ভূমিকা সম্পর্কে আরো স্থির নিশ্চিত হয়েছেন। আশির দশকের শেষে এসে জাতিসংঘ উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নকে তার কর্মসূচির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই ১৯৯০ সালের মার্চ মাসে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন শহরে এক বিশ্ব সম্মেলন ডেকে জাতিসংঘ ডাক দিয়েছে দু'হাজার সালের মধ্যে সারা পৃথিবীতে 'সবার জন্য মৌলিক শিক্ষা' নিশ্চিত করার। এদিক থেকে আমাদের অবস্থা কি? –খুব যে গর্ব করবার মতো নয় তা বলাই বাহুল্য।

বাংলাদেশের উদ্ভবকালে এদেশে মোটামুটি চারজনের একজন বয়স্ক ব্যক্তি অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ছিল। আজ দু'দশক পর এই হার বেড়ে শতকরা ৩২ অর্থাৎ তিনজনে একজনের মতো দাঁড়িয়েছে। তবে এই অগ্রগতিও সমগ্র জনসমাজে মোটেই সুষম নয়। শহরাঞ্চলে স্বাক্ষরতার যে হার, গ্রামাঞ্চলের হার তার প্রায় অর্ধেক; আবার পুরুষদের মধ্যে যে হার মেয়েদের মধ্যে হার তার অর্ধেক। এই বৈষম্যের ক্ষেত্রে দু'দশক আগের চেয়ে আজকের অবস্থার তেমন কোন তারতম্য ঘটেনি। অবশ্য প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের অনুপাত সামান্য বেড়ে আজ ৪৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে; তবে মাধ্যমিক স্তরে এই হার এখনও মাত্র ৩৪ শতাংশ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এই হার আরো কম––মোটামুটি এক–চতুর্থাংশ। শিক্ষকতায় মেয়েদের হার প্রাথমিক স্তরে আজো মাত্র ২০ শতাংশ, মাধ্যমিক স্তরে মাত্র ১০ শতাংশ।

আসলে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার উষালগ্নে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে মূলত যেসব সমস্যা দেখা দিয়েছিল, আজ দু'দশক পর সে সবের চরিত্র খুব একটা বদলায়নি। শুধু সময়ের ব্যবধানে আর দীর্ঘকালের অমনোযোগ–অবহেলার ফলে এসব সমস্যা অনেক ক্ষেত্রেই আরো জটিল রূপ নিয়েছে। সেদিন ডঃ কুদরাত–এ–খুদার নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশন এসব সমস্যার বিস্তারিত পর্যালোচনা করে নানা সুদূরপ্রসারী প্রস্তাব রেখেছিলেন। এসব প্রস্তাবের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল ১৯৮০ সালের মধ্যে অবৈতনিক, বাধ্যতামূলক ও একমুখী ৫ বছর মেয়াদী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১৯৮৩ সালের মধ্যে অনুরূপ ৮ বছর মেয়াদী সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন; কর্মমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ; ব্যাপক স্বাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তন; এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নারী–পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা। এসব লক্ষ্য অর্জনে আমাদের চরম ব্যর্থতা আর বেশি ব্যাখ্যা করে বলার প্রয়োজন নেই। বরং শিক্ষাক্ষেত্রের লক্ষ্যহীনতা, উৎপাদনমূলক কর্মধারার সঙ্গে সঙ্গতিহীনতা এবং সামগ্রিকভাবে ব্যাপক অরাজকতা আমাদের প্রতি মুহূর্তে এদেশের মানুষের সীমাহীন দুর্গতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

শিক্ষাক্রমের পরিস্থিতি

কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশন জাতীয় আশা–আকাঙ্খার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার যে ব্যাপক রূপান্তরের সুপারিশ করেন তার ফলে স্বভাবতই শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের জন্য যুগপোযোগী নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কমিশন তাঁদের রিপোর্টে বলেছিলেন ঃ

"বর্তমানে বিশ্বের উন্নত ও প্রগতিশীল দেশসমূহে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে যে ব্যাপক পরীক্ষা–নিরীক্ষা চলছে, সময়ের পরিবর্তন ও মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্রুত সমৃদ্ধির সাথে তাল রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে যে বিপুল রূপান্তর ঘটছে, আমাদের দেশ এখনও তার প্রভাব থেকে যেন বাইরে রয়েছে। প্রায় এক যুগ পূর্বে যে শিক্ষাক্রম ও পাঠসূচি ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছিল, সামান্য রদবদল করে মোটামুটিভাবে তাই আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে চালু রাখা হয়েছে। এ ধরনের রক্ষণশীল, প্রাচীনপন্থী, গতানুগতিক ও নিম্নমানের উপকরণ একটি প্রগতিশীল দেশের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চমানের শিক্ষার সহায়ক হতে পারে না।" (রিপোর্ট, ১৯৭৪ পৃঃ ২১৩)।

অনেকটা পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে কুদরাত–এ–খুদা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ তেমন দেখা যায়নি। তবে নতুন একটি দেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রমে ব্যাপক পরিবর্তন না এনেও কোন উপায় ছিল না। তাই অনেকটা খণ্ডিতভাবে ১৯৭৫ সালে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে ৫১ সদস্যবিশিষ্ট একটি 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটি ১৯৭৬ সালের মার্চ থেকে ১৯৭৮ সালের জুন পর্যন্ত কাজ করে সাতখণ্ডে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন সম্পন্ন করেন। এগুলি হচ্ছে যথাক্রমে প্রাথমিক, নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন–এর ওপরে। পরবর্তীকালে ১৯৭৮ সাল থেকে ধাপে ধাপে (১৯৭৮–৭৯ সালে প্রাথমিক স্তরে, ১৯৮০–৮২ সালে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ও ১৯৮৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে) এই নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি চালু করা হয়।

নতুন শিক্ষাক্রমে প্রাথমিক স্তরে 'পরিবেশ পরিচিতি' নামে একটি বিষয় প্রবর্তন করা হয়েছে; তাছাড়া শিশুদের কর্ম অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের নানা বিষয়কে সমন্বিত করে 'সাধারণ বিজ্ঞান' এবং ইতিহাস, পৌরনীতি ও ভূগোলের বিষয়বস্তু সমন্বয় করে 'সমাজ বিজ্ঞান' বিষয়টি প্রবর্তন করা হয়েছে। এই স্তরেও কর্মমুখী শিক্ষা/কর্ম অভিজ্ঞতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে ষাট ও সত্তরের দশকের বহুমুখী শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করে একটি একমুখী সাধারণ ধারার শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। এই ধারার আওতায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যাকে সমন্বিত করে 'সাধারণ বিজ্ঞান' সকলের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়। পৌরনীতি, অর্থনীতি ও বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সমন্বিত বিষয় হিসেবে পড়াবার ব্যবস্থা করা হয়।

অবশ্য পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে নানা তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমে বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। যেমন ১৯৮৩ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরে একমুখী শিক্ষার জায়গায় কার্যত 'কলা' ও 'বিজ্ঞানের' দু'মুখী শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করা হয়েছে। কলা ধারার শিক্ষার্থীদের জন্য 'সাধারণ বিজ্ঞান' এখন আর আগের মতো আবশ্যিক নয়, ঐচ্ছিক; তার ফলে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় ষাট শতাংশ শিক্ষার্থী আজ বিজ্ঞান শেখার আদৌ কোন সুযোগ পাচ্ছে না। এছাড়া কুদরাত–এ–খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের ব্যত্যয় ঘটিয়ে আশির দশকে ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক স্তরের প্রায় শুরু থেকেই ইংরেজি ও ধর্মশিক্ষার আবরণে আরবি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কমিশন যে সর্বজনীন আট বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন তা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমরা আজ কার্যত এক ত্রিমুখী শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করেছি––তাতে বাংলাভিত্তিক সাধারণ শিক্ষার মূলধারার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে একটি আরবিমুখী ও আরেকটি ইংরেজিমুখী ধারা। একটি দেশের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এমনি ত্রিমুখী শিক্ষা কতখানি সহায়ক তা আমাদের আজ গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে।

সাম্প্রতিককালে প্রধানত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় 'অর্জনযোগ্য প্রান্তিক যোগ্যতা' চিহ্নিত করে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু যে শম্বুক গতিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জনার কাজ এগোচ্ছে তাতে আশির দশকের প্রথম দিকে প্রবর্তিত মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকগুলির সংস্কারের কাজ শেষ হতে হতে বিশ শতক পেরিয়ে যেতে পারে। আমাদের পাশের দেশ ভারতে আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বিদ্যালয় পর্যায়ে ব্যাপক আকারে কম্পিউটার শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। আমাদের দেশে এ বিষয়ে ঘোষণামাত্র দেওয়া হয়েছে; কিন্তু পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হলেও এগুলি প্রবর্তনের কোন পদক্ষেপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

হতাশার চিত্র

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে শিক্ষা ও শিক্ষাক্রমের যে চিত্র তা হতাশাব্যঞ্জক বললে খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। যখন আমরা আকস্মিক অগ্রগতির কোন বিদ্যুৎছটা দেখি তখনও সে অগ্রগতিকে একটু খতিয়ে দেখলে অনেকাংশে মেকি বলে মনে হতে পারে। ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালে

আজকের কাগজ

তারিখ 18 FEB 1992

পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

3-B

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শেষ পরীক্ষায় পাসের হার মাত্র ৩০ বা ৪০ শতাংশ হবার পর যখন ১৯৯১ সালে চমক লাগিয়ে ফলাফল ৬০ শতাংশ ডিঙ্গিয়ে যায় তখন এই ফল কতটা শিক্ষার মানের অগ্রগতি বোঝায় সে বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। তেমনি যখন ১৯৯১ সালে সরবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন শুরু হয়, তখন একথা ভোলা যায় না যে, ১৯৫১ সালেও একটি আইন পাস করে এদেশে সাড়ম্বরে 'বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প' উদ্বোধন করা হয়েছিল, কিন্তু অল্পদিন পরই সে প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়। এবারের উদ্যোগ দ্রুত এবং সর্বাংশে বাস্তবায়িত হোক এই আমাদের প্রত্যাশা।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরই বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন যে আট বছর মেয়াদী একমুখী সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা তা থেকে আজ বহু দূরে সরে এসেছি; শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সামগ্রিকভাবে গণতান্ত্রিক ও বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু কার্যত ক্রমেই শিক্ষা ব্যবস্থা বেশি করে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কমিশন শিক্ষার জন্য মোট সরকারি ব্যয় 'অবিলম্বে' মোট জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশে এবং 'যত অল্প সময়ে সম্ভব' ৭ শতাংশে উন্নীত করার সুপারিশ করেছিলেন, কিন্তু তার দু'দশক পরও এই অঙ্ক দু'শতাংশের ওপরে তোলা সম্ভব হয়নি। তার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ব্যয়ের হার পৃথিবীর গরীব দেশগুলির মধ্যেও একেবারে শেষের সারিতে; অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে এই হার জাতীয় আয়ের তিন থেকে চার শতাংশের মধ্যে। নিতান্ত দায়সারাগোছের শিক্ষা ব্যবস্থায় ভর করে একুশ শতকের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর পৃথিবীর জন্য উপযুক্ত মানুষ তৈরি আদৌ সম্ভব বলে বিশ্বাস করা যায় না। একটি সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজ গড়তে চাইলে তার জন্য উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষাক্রম প্রয়োজন হবে; আর সেজন্য বড় আকারের উদ্যোগ এখনই নিতে হবে।

আজকের দিনে সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষের যেসব মৌলিক সমস্যা--অর্থাৎ জীবনমানের উন্নয়ন, পরিবেশের ভারসাম্য সংরক্ষণ এবং বিশ্বশান্তি--সে সবের সমাধানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার বিকাশ ও ব্যাপক আয়োজন। সারা পৃথিবীতে আজ গণতন্ত্রের হাওয়া বইছে; অস্ত্রসজ্জার নির্বুদ্ধিতা সম্বন্ধে মানুষ ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠছে; এ অবস্থায় আমাদের দেশে 'ক্যাডেট কলেজ' নামের ব্যয়বহুল বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব একান্তই বিসদৃশ হয়ে ওঠে। এককালে মূর্খত সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে স্থাপিত হলেও আজ আর এগুলি দেশরক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয় এবং এসব বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষার্থীর পেছনে যে ব্যয় হয় তার পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর পেছনে ব্যয়ের অন্তত দ্বিগুণ। নাম পালটে এগুলিতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের সাধারণ বিদ্যালয়ে পরিবর্তন করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়।

আসলে একটি গণতান্ত্রিক সমাজের প্রধান লক্ষ্য হবার কথা মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সমগ্র জনসমাজের উন্নয়ন--সারা দেশের মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তির স্ফুরণ, ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতার বিকাশ। এজন্য সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার যেমন গণতন্ত্রায়ণ প্রয়োজন, তেমনি গণতন্ত্রের প্রয়োজন, তেমনি গণতন্ত্রের প্রবর্তন চাই শিক্ষার আদান-প্রদানের প্রক্রিয়াতেও। এই ব্যবস্থায় স্বভাবতই সবচেয়ে বেশি জোর বাড়বে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষার ওপরে; সেই সঙ্গে জোর দিতে হবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান চেতনায় জনজীবনকে অভিষিক্ত করার ওপরে। এছাড়া শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষাক্রমের নিরবচ্ছিন্ন, পরিমার্জনা, নবায়ন ও উন্নয়নের সুসংহত ব্যবস্থা যেমন চাই, তেমনি চাই শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র যে শিক্ষক সমাজ তাদের জন্য উন্নতমানের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কাজের পরিবেশ।

আশার কথা, অবশেষে দেশে গণতান্ত্রিক চেতনার সুবাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। এই বাতাস আজো যে খুব সবল তা বলা যায় না; তবে অনুকূল পরিবেশে তা ক্রমে ক্রমে হয়তো বেগ লাভ করবে এবং শিক্ষার অঙ্গনে তার শুভ প্রভাব পড়বে। সাম্প্রতিককালে প্রাথমিক শিক্ষা, গণশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিশিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এসব উদ্যোগ প্রয়োজনের তুলনায় এখনও দুর্বল; তাছাড়া পরিমাণগত বিস্তারের সঙ্গে গুণগত উন্নয়নের যথাযথ সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন।

জাতিসংঘ ঘোষিত দু'হাজার সালের মধ্যে 'সকলের জন্য শিক্ষা' অর্জন আজ বাংলাদেশের জন্য দুঃসাধ্য মনে হয়; তবে এই সময়ের মধ্যে এদেশে বয়স্ক স্বাক্ষরতার হার বাড়িয়ে অন্তত ৬০ শতাংশ এমনকি ৮০ শতাংশে তুলতে না পারার কোন কারণ নেই। সে জন্য প্রয়োজন দেশব্যাপী শিক্ষা বিস্তারের ও বিকাশের ব্যাপক বহুমুখী কর্মসূচি। এদেশের মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং আজকের গভীর দারিদ্র্য ও দুর্গতি থেকে মুক্তি লাভের জন্য এছাড়া আর কোন সহজ পথ নেই।

শিক্ষার প্রশ্ন আজ বাংলাদেশের জীবন-মরণের প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শেষ বিচারে দেশে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব এবং বিকাশও এই প্রশ্নের মীমাংসার ওপর নির্ভরশীল।

তারিখ 18 FEB 1992
পৃষ্ঠা
আজকের কাগজ
37-2

দুয়ে দুয়ে চার হয়--এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে সাধারণভাবে স্বীকৃত। এ নিয়ে পাঁচজন মানুষের মধ্যে মতের তেমন গরমিল হতে দেখা যায় না। সব বিষয়েই যে পাঁচজনের মধ্যে মতের এমনি সাযুজ্য ঘটবে তা অবশ্য বলা শক্ত। তবু শিক্ষা প্রসঙ্গে দু'টি বক্তব্যে আশা করি সবাই একমত হবেন। তার একটি হল ঃ যে কোন সমাজের বিকাশ ও অগ্রগতি গভীরভাবে নির্ভরশীল সেই সমাজের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে। সে শিক্ষা হতে পারে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক। তবে যে কোন ধারারই হোক--সেই প্রাচীন চীনা, আর্য, গ্রীক বা আরব সভ্যতা হয়ে আজকের চীনা, জাপানী, মার্কিন, রুশ সভ্যতা পর্যন্ত সবখানেই মানবকল্যাণ ও সমাজ প্রগতির সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার এক অচ্ছেদ্য ও গভীর সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকে গত দু'দশকে এদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও নবায়নের লক্ষ্যে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদ্যোগ কিছু কম নেয়া হয়নি। ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন থেকে শুরু করে ডজনখানেক কমিশন, জাতীয় কমিটি ইত্যাদি গঠিত হয়েছে; কিন্তু সে সবের খুব যে একটা ফল হয়েছে তা বলা যায় না।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এদেশের মানুষের মনে বিপুল প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল। এই নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার কাছে সেদিন মানুষের আশা ছিল অনেক; সীমাহীন বিকাশের সম্ভাবনা সেদিন মানুষকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সেদিনের সরকার ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে যে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেছিলেন তাঁরা এই বড় মাপের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটিয়ে বলেছিলেন ঃ

"অবশেষে স্বাধীনতার নবীন সূর্যের উদয় (জনগণের) নবজীবন সৃষ্টির উজ্জ্বল সম্ভাবনার তোরণদ্বার উন্মুক্ত করেছে। এই নবজীবন সৃষ্টির অন্যতম চাবিকাঠি যে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত সে সত্য এদেশের জনগণ দীর্ঘকাল পূর্বেই উপলব্ধি করেন। এ জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কারের দাবী এদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। ....আজ স্বাধীনতার নতুন প্রভাতে এই শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন তাই জাতির সম্মুখে একটি মৌলিক দায়িত্বরূপে দেখা দিয়েছে।" (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪, পৃ.ক)

শিক্ষা কমিশন প্রায় দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম করে ব্যাপক মতামত জরিপ ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে শিক্ষা সংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদী রূপরেখা প্রণয়ন করেন। কিন্তু তারপর এই দু'দশকে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি কতখানি ঘটেছে? আমরা মানুষের 'নবজীবন সৃষ্টি'র পথে কিছুটা কি এগিয়েছি, না কেবলি শিক্ষার মানের অধোগতি, অস্থিরতা আর সন্ত্রাস গ্রাস করে আছে আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে?

অগ্রগতির খতিয়ান

সময়ের অমোঘ ধারায় যে সব সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটে তা থেকে এক ধরনের অগ্রগতির নজির দেখানো তেমন কঠিন নয়। ১৯৭১ সালে দেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি; দু'দশক পর ১৯৯১ সালে এই সংখ্যা বেড়ে মোটামুটি দেড়গুণ অর্থাৎ এগার কোটিতে দাঁড়িয়েছে। প্রাথমিক স্তরে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে একই হারে (৩১,০০০ থেকে ৪৬,০০০); তবে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে (৬২ লক্ষ থেকে বেড়ে ১১৯ লক্ষে দাঁড়িয়েছে)। মাধ্যমিক স্তরেও অগ্রগতির ধারা একই ধরনের--অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ (৬,৭০০ থেকে ১০,৮০০), শিক্ষার্থী সংখ্যা হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ (১৬ লক্ষ থেকে বেড়ে প্রায় ৩২ লক্ষ)।

সংখ্যাগত বৃদ্ধির মোটামুটি একই ধারা দেখা যাবে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রেও। বিশেষজ্ঞদের দীর্ঘকালের সুপারিশ সত্ত্বেও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটিকে প্রকৃত অর্থে 'মাধ্যমিক' হিসেবে না ধরে আজো উচ্চ শিক্ষার স্তর হিসেবেই গণ্য করা হয়। সে হিসেবে উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী কলেজের মোট সংখ্যা বেড়ে হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ (৪৫০ থেকে ৮৩০); সেখানে শিক্ষার্থী সংখ্যাও বেড়েছে প্রায় তেমনি--চার লাখ থেকে বেড়ে প্রায় ন'লাখের কাছাকাছি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ২৪,০০০ থেকে বাড়তে বাড়তে ৫১,০০০-এ পৌঁছেছে; সেদিক থেকে বলতে গেলে বরং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের চেয়ে উচ্চ শিক্ষার স্তরটিই বেশি এগিয়ে আছে।

সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে নাটকীয় বিস্তার ঘটেছে মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রে। দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত নানা পর্যায়ের মাদ্রাসার সংখ্যা ১৪০০ থেকে বাড়তে বাড়তে ৬,০০০-এ পৌঁছেছে; এসব মাদ্রাসার শিক্ষার্থী সংখ্যা চার লাখ থেকে বেড়ে দশ লাখের ওপর উঠেছে। ইবতেদায়ী পর্যায়ের মাদ্রাসায় বৃদ্ধির হার আরো বেশি; এ ধরনের ১৬,০০০ মাদ্রাসায় আজ শিক্ষার্থী সংখ্যা সতের লাখের ওপর দাঁড়িয়েছে।

আবার এর উল্টোপিঠে ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটেছে নিতান্ত শম্বুক গতিতে। পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সংখ্যা ১৫টি থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮-তে; কিন্তু শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০,০০০ থেকে বেড়ে এখনো ১২,০০০ পেরোতে পারেনি। দেশে বৃত্তিমূলক